স মী ক র ণ

রাজশ্রী বসু অধিকারী

ব ই ব ন্ধু

গোলাপি রঙের শরীরটা তরতর করে ওপরে উঠে গেল। এক, দুই, তিনতলা ছাপিয়ে চারতলা। লম্বা বাঁশের ওপর আড়াআড়ি বাঁশ কেমন ছক করে করে বাঁধা। দেখে মনে হয় ওঠা কত সহজ। কিন্তু পা রাখলেই ভেতরে শিরশির। এই মনে হয় পড়ে গেলাম নীচে। পড়ে যেতে বড্ড ভয় করে সোনাইয়ের। 'কী হল? এসো! ওই খাঁজে খাঁজে পা রাখো। আমার মতো বাইতে যেয়ো না,' মোহিনী হাসে রেলিঙের ধারে দাঁড়িয়ে। সোনাই গম্ভীর হয়। ওর ভেতরের ভয়টা ঠিক বুঝতে পেরেছে মোহিনী। কিন্তু সেটা হতে দেওয়া যায় না। ব্যাকপ্যাকটা অকারণে একবার সামনে আনে। কিছুটা নাড়াচাড়া করে, আবার স্বস্থানে রাখতে রাখতে বলে, 'তুই এগো আমি আসছি।' 'আচ্ছা, আমি ভেতরে যাচ্ছি, তুমি তবে এসো', বলেই রেলিঙে পা রেখে মোহিনী ধুপ করে লাফিয়ে ছাদের মধ্যে হারিয়ে যায়। সোনাই ধীরেসুস্থে ওর বলে যাওয়া পথে বাঁশের খাঁজে খাঁজে পা রেখে উঠতে শুরু করে।

এত ঝামেলার কিছু ছিল না। মেইন গেট দিয়ে ঢুকে সিঁড়ি উঠলেই চলত। কী যে বায়নাক্কা মোহিনীর, কী? না পেছনের বাঁশের ম্যারাপ ধরে উঠব। সামনের দিকে অবশ্য অনেকগুলো চোখ আর বহু অনাকাঙ্ক্ষিত প্রশ্ন। সোনাই সেসব চায় না। ইনফ্যাক্ট এ-বাড়ির কারওর সঙ্গেই কথা বলতে আর ভালো লাগে না ওর। শুধু রানিদিদা বাদে। কিন্তু রানিদিদাকে তো চাইলেই দেখা যায় না। সে কোনো বাজে প্রশ্ন করার মানুষও নয়।

শ্রীরামপুরে জিটি রোডের ওপর এই বাড়িটা বানিয়েছিলেন সোনাইয়ের ঠাকুরদার ঠাকুরদা। শখ করে বাড়ির নাম দিয়েছিলেন চন্দ্রভবন। লোকের মুখে মুখে এত দশকে এটা এখন চাঁদের হাট। হাসি পায় সোনাইয়ের। চাঁদের হাটই

বটে। এই দু'হাজার কুড়ি সালে এ-বাড়ির ভাঙা চাঁদের টুকরোরা সব এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে বংশের মুখ উজ্জ্বল করছেন। এক একজনের এক এক ইতিহাস, শুনলে ক্ষ্যাপা, পাগলেও হাসবে। কাউকে পরিচয় দিতেও লজ্জা করে যে ও এই বাড়িরই ছেলে।

বাড়িটা কত যুগের পুরনো কেউ জানে না। ব্রিটিশ আমলের তো বটেই। ডিজাইনেই মালুম। কয়েক বিঘা জমির ওপর লোহার গেট, বাগান, ফোয়ারা, পাথরের সিংহ, শ্বেতবরণা স্বল্পবেশ মেমসাহেব, এইসব আতিশয্য পার করে তারপর আসল বাড়ি। অনেকটা জমি জুড়ে বাঁকা চাঁদের ভঙ্গিমায় সে কোনো এককালে মাথা তুলেছিল। দেখে মনে হয় অনেক তলা। আসলে মাত্র তিনতলা। তখনকার দিনে অবশ্য এই তিনতলা বাড়িই সাতমহলা প্রাসাদের চেয়েও বেশি ছিল। প্রত্যেক তলার দেওয়াল জোড়া খড়খড়ি লাগানো লম্বা লম্বা সবুজ রঙের জানলা, কতগুলো তা গুনে শেষ করা যাবে না। ওপরে কারুকাজ করা রেলিঙের পেছনে বিশাল ছাদ। বাড়িটার স্তরে স্তরে কত যে আলাদা আলাদা অংশ, কত যে গলিঘুঁজি আর কতরকমভাবে যে একটার সঙ্গে আরেকটা অংশকে বিভিন্ন সাইজের ছোটো, বড়ো, মেজো ব্রিজ দিয়ে জোড়া লাগানো হয়েছে সেটা একটা গবেষণার বিষয়। ছোটোবেলায় এই গবেষণাটা সোনাইয়ের একটা প্রিয় খেলা ছিল। টানা বারান্দা ধরে ছুটতে ছুটতে চলে যেত এদিক সেদিক আর সরু লোহার বা সিমেন্টের ব্রিজ দিয়ে অন্য কোনো একটা বারান্দা অবধি গিয়েই আবার ছুটে ফিরে আসত রানিদিদার কাছে। সে যেন একটা মহাদেশ আবিষ্কারের মতোই আনন্দ ছিল তখন। কিন্তু এখন আর সেই দিনও নেই, আনন্দও নেই। এখন সবটাই নিরানন্দ। এখন শুধু দায়।

তাই সামনের দিক দিয়ে আর ঢুকতেও ভালো লাগে না। তাই বলে পেছনদিক দিয়ে ঢোকার চিন্তাও আসেনি কখনও ওর মাথায়। আজকেই মোহিনী বায়না ধরে বসল। অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় সোনাইও রাজি হয়েছে শেষ পর্যন্ত। পেছন দিকে যেখানে মেরামতির জন্য ম্যারাপ বেঁধে রাখা হয়েছে প্রায় একবছর ধরে, সেইখান দিয়ে একবারে ওপরে উঠে নিজের কর্তব্য কর্মটি করে চলে যাওয়া। আদেশ মতো না এলেই আবার হাজার কথা শুনতে হবে। আর কথা

শুনতে সোনাইয়ের একেবারে ভালো লাগে না। কেউ ওকে কোনোকিছু নিয়ে কথা শোনাবে এটা সহ্য হয় না ওর। সে যদি মা-ও হয়, তবুও না। তাই এই রিস্ক নিয়ে চারতলায় ওঠা।

ভাবতে ভাবতে আর সাবধানে পা রেখে রেখে সোনাই রেলিঙের ধার পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। মোহিনী তো আগেই ঢুকেছে। এবার ওকে ভেতর থেকে খুঁজে নিতে হবে। লাফ দিয়ে রেলিং টপকাতে যাবে এমনসময় সামনে তাকিয়ে থেমে যায় ও। বেশ কিছুটা দূরে লম্বা সাদা পাজামা পাঞ্জাবি পরা সেই মানুষটা মোহিনীকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে রয়েছে। পিঠে হাত বোলাচ্ছে। মোহিনীর মুখটা সোনাইয়ের দিকেই। এখনও দেখতে পায়নি ওকে তবে যে কোনো সময়েই দেখবে। কী করবে ভেবে না পেয়ে কিছুক্ষণ রেলিঙে পা রেখে অষ্টাবক্র মুনির মতো স্থির হয়ে থাকে ও। ইচ্ছে হয় এক লাফে আবার নেমে যায় নীচে। রাগে গা জ্বলছে এরকম একটা সিন দেখে। কী নির্লজ্জ একটা লোক। খোলা ছাদে একটা মেয়েকে পেয়ে জড়িয়ে ধরল। ধরেই আছে। কেউ চট করে আসে না এখানে ঠিকই, কিন্তু আসতেও তো পারে। শরিকি বাড়িতে এটা তো কমন স্পেস। আসতে তো কারোর বাধা নেই। দেখে মনে হচ্ছে পৃথিবীতে যাই ঘটে যাক ওনার পরোয়া নেই কোনো। সোনাইয়ের ভেতরটা কুঁচকে থাকে খারাপ লাগায়।

এতক্ষণে মোহিনী দেখতে পেয়েছে ওকে। যেন কিছুই হয়নি এইভাবে গলা উঁচু করে বলে, 'এইটুকু উঠতে তোমার এত সময় লাগল সোনাদাদা! এবার ভেতরে চলো...' সোনাই-এর নাম শুনে লোকটার হাত সরে যায় মোহিনীর পিঠ থেকে। বোধহয় একটু লজ্জাও পেয়েছে, এভাবেই ছেড়ে দেয় ওকে। সামনের দিকে এগিয়ে আসে দু'দিকে হাত মেলে। যারা চোখে দেখতে পায় না তারা এভাবেই হাওয়াতে ব্যালেন্স খুঁজে হাঁটা চলা করে। অত্যন্ত সুপুরুষ এই তিপ্পান্ন বছরের মানুষটি সোনাইয়ের বাবা। সোনাই অর্থাৎ স্বর্ণকমল সেন এই একদা বিখ্যাত সেন বাড়ির সর্বকনিষ্ঠ সদস্য। এই অন্ধ মানুষটি সোনাইয়ের বাবা। ওঁর কাছে এসে এইরকম একটা সারা শরীর পাক দিয়ে ওঠা অনুভূতি হওয়াটা রীতিমতো অস্বাভাবিক সেটা জানে ও। বরং উল্টোটাই হওয়া উচিত ছিল। ভীষণ

ভালোলাগায় বাবাকে জড়িয়ে ধরা উচিত ছিল ওরই। কিন্তু ওর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা উলটো। ছেলেবেলা থেকে জীবনকে উলটোভাবে পেতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছে সোনাই। তাই মোহিনীর গোলাপি সালোয়ার কামিজ পরা পিঠে বুলিয়ে চলা সরু লম্বা আঙুলগুলো, ওই হাতের অনামিকায় ঝিকিয়ে ওঠা হিরের আংটি, সব মিলিয়ে একটা বমি ভাব এনে দেয় সোনাইয়ের মনে।

'কী রে! সোনাই? এবার এতদিন পরে এলি? জয়েন্ট কেমন হল? খুব পড়ার চাপ ছিল তাই না?', কথা বলতে বলতে অনেকটা কাছে এসে দাঁড়ায় লোকটা, যার পোশাকি নাম স্বর্ণেন্দুবিকাশ সেন। যে কিনা তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে অন্ধ দুই চোখ নিয়ে। এটা অবশ্য সোনাইয়ের মায়ের বক্তব্য। কিন্তু বাবাও এটাই মনে করে। সোনাইয়ের স্মৃতিতে যে ছিন্ন শৈশব, তাতে এই কথাটার বহু পুনরাবৃত্তি রয়েছে। কাছে এগিয়ে না গিয়ে দু'পা তফাতে সরে দাঁড়ায় সোনাই।

'মোহিনী তুই যাবি?'

'সে কী! এখুনি তো এলাম। একটু থাকব না!'

'তোর ইচ্ছে হয় তুই থেকে যা। আমার কাজ আছে। আমি এগোলাম।'

এবার আর রেলিং দিয়ে না নেমে সিঁড়ির দিকে এগোতে শুরু করে সোনাই। ভেতরটা কেমন বিচ্ছিরি লাগছে ওর। ওই জড়িয়ে ধরার দৃশ্যটা চোখ থেকে যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে এখান থেকে, এই বাড়ি থেকে যত তাড়াতাড়ি বেরতে পারবে ততই মঙ্গল।

সোনাইয়ের গলার আওয়াজে, কথার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পড়ে লোকটা। সে বুঝতেই পেরেছে বিরূপতার হাওয়া। আবার এগিয়ে আসে সোনাইয়ের দিকে। সোনাইয়ের কাঁধে হাত রেখে কেমন পাতা খসার ভঙ্গিতে বলে, 'তোর মা ভালো আছে? প্রেসারের ওষুধটা নিচ্ছে ঠিকমতো?' মায়ের উল্লেখে আরও খারাপ লাগে সোনাইয়ের। মনে হয় যে হাতে মোহিনীকে একটু আগে জড়িয়ে ধরেছিল, সেই হাতটা ছুড়ে ফেলে দেয়। কোনো উত্তর না দিয়ে এগিয়ে যায়।

ছাদ থেকে নেমে এসে তিনতলার লম্বা বারান্দা। তারই একদিকে লোকটার অংশ। ওইখানে তিনখানা ঘর, বারান্দার ঘেরাটোপে কেটেছে সোনাইয়ের জীবনের প্রথম দশ-এগারোটা বছর। তবুও একবারও সেদিকে না গিয়ে সামনে

এগিয়ে যায় ও। বারান্দা ধরে সোজা সামনে এগিয়ে বেশ কিছুটা ডান দিক, বাঁ দিক করে তারপর সেই সরু ব্রিজটা। একটা বিল্ডিং থেকে চলে গিয়েছে ওপাশের আরেকটা বিল্ডিঙের যোগসূত্র হয়ে। এত সরু আর দু'পাশে এত ছোটো লোহার কারুকাজ করা রেলিং যে ছোটোবেলায় ও এখান দিয়ে যেতে রীতিমতো ভয় পেত। যত ভয় তত আকর্ষণ। সোজা পায়ে পায়ে ওপাশে গিয়ে উঠলেই ওদের বিশাল রান্নাঘর। তার পর থেকে রানি দিদার অংশ। তখন ওপাশের রানি দিদার ঘরটাই ওকে টানত বেশি। সারাক্ষণ ওখানেই পাওয়া যেত ওকে। কিন্তু আজ পা টিপে টিপে সে জায়গাটা পার করে ও। আরও কিছুটা এসে একেবারে নামার সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়ায়। পেছনে পেছনে প্রায় দৌড়ে আসছে মোহিনী। এবার ডাকে, 'আরে সোনাদাদা তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছ কেন? আমিও যাব তো...'

মোহিনীর হাঁফ ধরে গেছে দেখাই যাচ্ছে। ফর্সা মুখটা লাল টুকটুকে হয়ে উঠেছে। ওর দিকে একপলক তাকিয়ে বেশ কিছু দূরে বাড়ির শেষ মাথায় বুড়িপিসিকে দেখতে পায় সোনাই। সে কাপড় মেলছিল দড়িতে। হাত নাড়ছে ওকে দেখে। মেশিনের মতো হাতটা তুলে মাথার ওপর নাড়ায় সোনাই। অদ্ভুত লাগে ওর বুড়ি পিসিকে দেখলে। কত অল্পবয়স থেকেই বুড়ি পিসি বুড়িয়ে গেছে। এখন আরো খারাপ হয়েছে চেহারা। অথচ একসময় ডাকসাইটে সুন্দরী ছিল। এত বড়ো বাড়িতে এতগুলো কাকা জ্যাঠা দাদা থাকতে কেউ বুড়িপিসির একটা ব্যবস্থা করতে পারেনি বা করেনি। বিয়ে নিয়ে অনেক গল্প আছে। মায়ের কাছে কিছু কিছু শোনা আছে ওর। বুড়িপিসির কথা ভাবলেই একটা নতুন উপন্যাসের প্লট হয়ে যাবে। ওদিকটায় আনমনে তাকিয়ে মোহিনীর দিকে তাকায় সোনাই।

'তুই চলে এলি কেন? যা, বাপির কাছ থেকে আরেকবার ঘুরে আয়...'

'যাব?' মোহিনী অবাক গলায় বলে।

'যা, উনি বোধহয় চাইছিলেন তুই আরেকটু থাক। আমি ওভাবে রিয়্যাক্ট করায় তুই চলে এলি তো... ওনার কথা শেষ হয়নি তোর সঙ্গে...'

'তুমি ভেবে বলছ? আবার আমার ওপর রেগে যাবে না তো?'

'বললাম তো যা ঘুরে আয়। তাড়াতাড়ি আসবি। আমি নীচে আছি', ক্লান্ত গলায় বলে সোনাই। হঠাৎই কেমন অবসন্ন লাগছে ওর। ভেতরের গনগনে রাগটা দুম করে কেমন নিস্তেজ করে দিল ওকে। গোলাপি ওড়না উড়িয়ে মোহিনী আবার ছুটে ছুটে চলে যাচ্ছে যেদিক থেকে এসেছিল। সোনাই এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে সামনে এগোয়। পায়ে পায়ে নামতে থাকে সিঁড়ি বেয়ে। মাথার মধ্যে একঝলক ভেসে যায় একটা প্রশ্ন। একবার কি রানি দিদার ঘরটা উঁকি দিয়ে যাওয়া উচিত ছিল? যাকগে এখন আর ফিরে গিয়ে লাভ নেই। ওর অনেক প্রশ্ন যার উত্তর ওর কাছে নেই। এখানে এইসব কারণেই আসতে ইচ্ছে করে না ওর। কিন্তু মা যে কেন এই ঝামেলায় ফেলে ওকে!

ক্লান্ত বিরক্ত মনে নামতে থাকে সোনাই। শেষের মুখে দালান যেখানে থেমেছে সেখানটায় সিঁড়িটা বিশাল চওড়া হয়ে ধাপে ধাপে নেমেছে উঠোনে। ঠিক মুখোমুখি দেখা মেজোকাকা সূর্যকিরণের সঙ্গে। লুঙ্গিটা যে কোনো সময় খুলে যাবে এইভাবে কষিতে আলগা গিঁট মারা। একটা নস্যি রঙের ফতুয়া বিশ্রীভাবে গায়ে লেপটে আছে। ঘেমে পুরো স্নান করে উঠেছে। দু'হাতে দু'খানা বাজারের ব্যাগ। তা থেকে উঁকি মারছে পুঁই শাকের ডগা, শজনে ডাঁটার মাথা। আরেকটা ব্যাগে ছোপ ছোপ মাছের রক্ত। একদা টকটকে ফরসা রং এখন তামাটে। তাতে জায়গায় জায়গায় অযত্নের কালশিটে। দু'চোখের নীচে কোলবালিশের মতো ফোলা। ভয়ঙ্কর মদ্যপানের ইতিহাস বয়ে বেড়াচ্ছে ওই চোখ। এই মানুষটাকে দেখলেই সোনাইয়ের গা গুলিয়ে ওঠে। মায়ের কথা মনে পড়ে যায়। মা বলত এই লোকের নাম সূর্যকিরণ! ঠিক যেন কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন। সোনাই সরে পড়ার সুযোগ পায় না। একগাল হেসে কাছে আসে মেজোকাকা।

'বা বা বা! সক্কাল সক্কাল বাড়ির ছেলে বাড়িতে! কী খবর! অ্যা? কী মনে করে সোনাইবাবু?'

'ওই এসেছিলাম একটু', সোনাই মুখ গোঁজ করে উত্তর দেয়।

'এসেছিলে তো চলে যাচ্ছ কেন? একবেলা থেকে দুটো খাওয়াদাওয়া করে গেলে কি মানহানি ঘটবে? ভালো মাছ এনেছি... মেজোকাকির হাতে নাহয়

দু'টো খেলি... আয় ওপরে চল...'

'না না... আমি এখন যাই... আমার কাজ আছে,' সোনাই পা বাড়ায়।

'শোন এদিকে...' পেছন থেকে ডাকে মেজোকাকা। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায় সোনাই।

'তোর মাকে বলিস আমি একদিন যাব। জরুরি কথা আছে আমার।'

'মার সঙ্গে কী কথা তোমার? যা বলার আমাকে বলো,' সোনাই ফুঁসে ওঠে। আর মেজোকাকা হ্যা হ্যা করে হাসতে শুরু করে,

'ও বাবা... ঢোড়া সাপের ছেলে কালনাগিনী! অ্যা! বলে কিনা আমাকে বলো... আরে বাবা সব কথা কি তোকে বলার নাকি তোর সব কথা শোনার বয়স হয়েছে! তোর মার সঙ্গে আমার কিছু পার্সোনাল কথা থাকতে পারে না?'

'না,' বিকট চিৎকারটা করেই ফেলে সোনাই। আরও কিছু বলে ফেলত হয়তো যদি না মোহিনী এসে ওর হাতটা ধরে টানতে শুরু করত, 'সোনাদাদা, চলে এসো। চলো, বাড়ি চলো। আর একটুও দাঁড়াবে না তুমি এখানে।'

প্রায় হিড়হিড় করেই মোহিনী ওকে একদমে টেনে নিয়ে আসে বাড়ির বাইরে। তারপর পথচলতি একটা টোটোকে হাত দেখিয়ে থামায়। ওকে বসিয়ে নিজেও বসে।

'কোন্‌দিকে যাবেন?'

'গঙ্গার পাড়ে, বড়ো তেঁতুলতলা।'

সোনাই এর লাল হয়ে ওঠা মুখের দিকে তাকিয়ে বলে মোহিনী।

দুই

'আমি দুঃখিত, একটু দেরি হয়ে গেল। অনেকক্ষণ এসেছ তোমরা' আদৃতা চেয়ার টেনে বসতে বসতে বলে। টেবিলের সামনে জড়ো হয়ে থাকা পাঁচ ছ'জন ভিন্নবয়সি মেয়ে, জনা তিনেক পুরুষ। তারাও এবার দেওয়ালের পাশে পাশে রাখা চেয়ারগুলো টেনে নিয়ে বসে পড়ে। মিত্রা দু'হাত ভর্তি ফাইল এনে টেবিলে রাখতে রাখতে বলে, 'আমি ওঁদের বলেই দিয়েছিলাম যে আজ একটু দেরি

হবে।'

'আজকের প্রোগ্রামগুলো একবার বলে দাও তো মিত্রা...' আদৃতা একটা হলদে ফাইল টেনে নিতে নিতে বলে।

'ওটা পরে দেখলে চলবে। আগে এইটা...' একটা অফিসিয়াল চিঠি এগিয়ে দেয় মিত্রা।

'কী এটা?' দ্রুত চোখ বোলায় আদৃতা।

'এ তো সেই একই কথা বলছে বারুইপুর কারেকশনাল হোম। তাঁদের কাছে শেহনাজ খাতুন নেই? সবাই যদি নেই বলে তাহলে মেয়েটা গেল কোথায়? কোর্ট রেকর্ডস তো বারুইপুর দেখিয়েছিল, না?'

'হ্যাঁ...' মিত্রা বলে। ফাইল থেকে আরেকটা কাগজ বের করে এগিয়ে দেয়। হাত নেড়ে দেয় আদৃতা। ওটা তার দেখা আছে।

'সুমঙ্গল কোথায়? ডাক তো তাকে।'

মিত্রা মাথা নিচু করে।

'আহ, কী হল? কোথায় সুমঙ্গল?'

'এসেছিল একবার। চলে গেছে...'

'চলে গেছে? আমার সঙ্গে দেখা না করে, কিছু না বলে? ছেলেখেলা নাকি? এই মেয়েটার কী হবে এবার?'

কোণের চেয়ার থেকে শাড়িতে মাথা মুখ ঢাকা একজন মহিলা শব্দ করে কেঁদে ওঠে, 'কী হবে দিদি... আমার মেয়েটা বেঁচে আছে তো!'

'আহ... চুপ করুন। কান্নাকাটির সময় নয় এটা। সবার শেষে কোর্ট তো আছে। ভরসা রাখুন।'

মহিলাটির স্বামী হতাশ ভঙ্গিতে বলে ওঠে, 'দু'সপ্তাহ ধরে ওখানেই যাচ্ছি, উকিলবাবু বলছেন কি মেয়ে আছে বারুইপুর জেলে। বারুইপুর গেলাম তো বলল কি মেয়ে আছে প্রেসিডেন্সি জেলে। সেখান থেকে বলল আলিপুর মহিলা জেলে...'

'শুনুন, দরকার হলে আমি নিজে কোর্টে যাব। এত কিছু তো জানেন না কোর্ট। সেখানে সব জানাতে হবে। স্পেশাল অর্ডার বের করতে হবে। এত ভেঙে

পড়ার কিছু নেই। আপনাদের ঠিকানা ফোন নম্বর তো আছে, দেখছি কী করা যায়।'

মহিলাকে তুলে ধরে ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায় তার স্বামী। আর ছটফট করে ওঠে আদৃতা, 'উফফ... এই সমস্ত টাইমে সুমঙ্গলকে কত দরকার, আর আজই সে চলে গেল সাতসকালে এসে? ইরেসপন্সিবল...'

'দিদি...'

'কী হয়েছে?'

মিত্রা ড্রয়্যার টেনে একটা মুখবন্ধ ব্রাউন খাম এগিয়ে দেয় আদৃতার দিকে, 'এইটা সুমঙ্গলদা দিয়ে গেছে আপনার জন্য।'

'কী এটা?' খামটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে আদৃতা। খুলে দেখতে গিয়েও খোলে না। হ্যান্ডব্যাগ খুলে রেখে দেয়।'

'সুমঙ্গলকে একটা ফোন কর মিত্রা। বল একবার আসতে। আর বাইরের লোকগুলোর মধ্যে দ্যাখ তো নসিপুরের রিপ্রেজেন্টেটিভ কে আছে। তাকে ডেকে দে... আগে ওর সঙ্গে কথা বলি, তারপর বাকিদের ডাকছি...'

'দিদি, আমি এসেছি নসিপুর থেকে,' ঘরের মধ্যেই বসা একজন উঠে আসে টেবিলের ধারে।

হাত বাড়িয়ে দেয় আদৃতা, 'কই দেখি লিস্ট দেখি...'

লোকটার এগিয়ে দেওয়া খাতাখানায় চোখ বোলায় আদৃতা। এগুলো ওই লোকালিটির ডিসট্রেসড মহিলাদের লিস্ট, তাঁদের মধ্যে কতজন গত মাসে এই সংস্থা থেকে বিভিন্ন খাতে কত অনুদান পেয়েছে, সবগুলো প্রোডাকশন ইউনিট থেকে তাঁদের কীরকম ইনকাম হয়েছে তার হিসেব।

আজ থেকে প্রায় আট বছর আগে আদৃতা নিজের পাড়ায় শুরু করেছিল তার সংস্থা স্বয়ম্বর। একটু একটু করে তার গণ্ডি এখন শ্রীরামপুর ছাড়িয়ে কলকাতা এবং দক্ষিণ বাংলার তিন-চারটি জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে। প্রায় তিরিশ-বত্রিশটি গ্রামে এখন স্বয়ম্বরের নিজস্ব ইউনিট কাজ করে। আদৃতার সঙ্গে আছে বাইশজন মহিলার টিম যারা নিজেরা ঘুরে ঘুরে সবটা দেখাশোনা করে। নানারকম হাতের কাজ, সেলাই, শাড়ি প্রিন্টিং, ড্রেস মেটেরিয়াল প্রিন্টিং, শোলা, মাটি, তুলোর